Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-1 July 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লোককথার সুলুক সন্ধান

অন্তরা গোস্বামী

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2024/08/4_Antara-Goswami.pdf

সারসংক্ষেপ: বঙ্কিম-সাহিত্যে জনসাধারণের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধর্ম সংস্কারের পাশাপাশি বাংলার লোকায়ত উপাদান খুব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো লোককথা। বঙ্কিম-সাহিত্যে এই লোককথার নানা রূপের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে, সে রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা বা ইতিকথা যাই হোক না কেন। এই আলোচনা একদিকে বপন করেছে তৎকালীন জীবন প্রবাহকে, অন্যদিকে লোকায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে। এই আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের এক অজানা সত্তাকে তুলে ধরেছে।

সূচক শব্দ: লোককথা, রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা, ইতিকথা

বঙ্কিম-সৃষ্টির পথ চলা শুরু হয় সুপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও নবাগত পাশ্চাত্য সাহিত্যের যৌথবন্ধতায়। তবে এই দ্বিবেণীসঙ্গমের অন্তরালে ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে লোকসংস্কৃতির ধারা। এই লোকসংস্কৃতি মানবগোষ্ঠীর ভাবধারাকে বহন করে চলে। সমাজের বিশেষ রীতি-নীতি, প্রথা-সংস্কার, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি হলো লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে একদিকে ধরা পড়েছে বাংলার লোকায়ত উপাদান, অপরদিকে জনসাধারণের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধর্ম সংস্কার ইত্যাদি। আসলে যখন কোনো সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্য রচনা করেন, তখন লোকজীবনের প্রাণরস দ্বারাই সাহিত্য যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁঠালিয়াতে। মধ্যবিত্ত পরিবারের গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে লোকউপাদানগুলি সুচারুভাবে তাঁর লেখনীতে জায়গা করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশজ উপাদানগুলি পাশ্চাত্যের উন্মুক্ত চিন্তার সঙ্গে একীভূত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনক। তিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, তাই তাঁর লেখায় পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত মননের পরিচয় থাকলেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন লোকসাহিত্যই বাংলার আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তিভূমি। সেই কারণেই বাংলার রূপকথা, ব্রতকথা, লোকগীতি, ছড়া ইত্যাদি লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তিনি তাঁর সৃষ্টিতে তার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো লোককথা। লোককথায় কাহিনির বিন্যাস সহজেই ধরা পড়ে। শিশু থেকে বয়স্ক যে-কোনো বয়সের ক্ষেত্রে লোককথা আকর্ষণের বিষয়। এই লোককথার কয়েকটি ভাগ আছে। যেমন রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা, ইতিকথা ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই লোককথার সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রও একাধিক উপন্যাসে এই লোককথাগুলির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

রূপকথা:

লোককথার সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা এটি। একজন বিশেষজ্ঞের মতো এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় — "লোককথার মধ্যে চরিত্র এবং দেশকালের যে নির্বিশেষত্ব আছে, তাহাদিগকেই আধুনিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার যুগে সাধু-বেশ পাত্রে রূপায়িত করিয়া লইয়াই আধুনিক উপ্যাসের সূচনা হইয়াছে। লোককথার রাজপুত্রই আধুনিক কথাসাহিত্যের জগত সিংহ এবং লোককথার মধুমালাই তিলোত্তমা।"[১] সত্যি রূপকথা হলো কল্পলোকের পরীকথা। রূপকথার রাজা রানী হয় নামহীন, রচনায় থাকে নীতিধর্মিতা, সর্বাত্মক মিলনে হয় কাহিনির পরিসমাপ্তি। এই সমস্ত রূপকথার বৈশিষ্ট্যের ছোঁয়াও খুঁজে পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনির কাঠামোটির সূচনা অনেকটা রূপকথার আঙ্গিকেই হয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনির সূচনা হয়েছে রূপকথার পরিবেশ রচনার মাধ্যমে। এরপর কাহিনির অগ্রসরের সঙ্গে কাহিনির গতিমুখ রূপকথার রোম্যান্টিকতার জগত থেকে বাস্তবতার জগতে মিশেছে। সমালোচকের লেখনীতে কাহিনির সূচনা ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে —

"এক রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যে হয়ে আসতে দেখে রাজপুত্র জোরে ঘোড়া ছোটালেন। সামনে তেপান্তরের মাঠ। সন্ধ্যের আগেই মাঠ পেরুতে হবে। কিন্তু বিশাল তেপান্তরের মাঠ পার না হতেই সূর্য গেল অস্তাচলে। চারিদিকে সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসছে। আকাশ মেঘে ঢাকা... কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল বৃষ্টি। রাজপুত্র পথ হারালেন, ঘোড়া চলল আপন ইচ্ছায়। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকে রাজপুত্রের দৃষ্টিগোচর হল শুভ্র অট্টালিকা।"[২] এখানেই নায়ক নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ লেখক দেখালেন। আসলে রূপকথার কাহিনির আঙ্গিকেই লেখক 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের পরিকাঠামো রচনা করেছেন। তাই নায়ক নায়িকার মিলন, বিচ্ছেদ, ভুল বোঝাবুঝি এবং শেষে পুনরায় মিলনের মধ্য দিয়ে কাহিনি রূপকথার আমেজকে বহন করে নিয়ে চলেছে।

'মৃণালিনী' উপন্যাসেও রূপকথার প্রয়োগ দেখা যায়। এই উপন্যাসের সূচনাতে মহাদূর্যোগের রাতে নায়ক নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ দেখানো হয়েছে, তারপরেই দেখানো হয়েছে গোপনে উভয়ের বিবাহ, প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিকল্পনায় উভয়ের বিচ্ছেদ, নায়িকার সন্ধানে নায়কের বহু দেশভ্রমণ, নানা প্রতিবন্ধকতার পথ বেয়ে উভয়ের মিলন। এই সমস্ত উপাদানই রূপকথার উপাদান যার সার্থক প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মৃণালিনী' উপন্যাসে ঘটিয়েছেন। শুধু নায়ক নায়িকার মিলনই নয় রূপকথার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো দুষ্টের-দমন। এখানেই লেখক এই বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ করেছেন। তাই কাহিনির শেষে ষড়যন্ত্রকারী যথাযোগ্য শাস্তি পেয়েছে, যবনের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে এবং শেষে অপঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে। এইভাবে রূপকথার উপাদানের প্রয়োগ যথার্থভাবেই এখানেও ঘটেছে।

শুধু 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনী'ই নয় বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে রূপকথার আঙ্গিক লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাজসিংহ', 'ইন্দিরা', 'দেবী চৌধুরাণী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেও একই ধারা লক্ষিত হয়। 'যুগলাঙ্গুরীয়' রোমান্সধর্মী উপন্যাস হলেও রূপকথার ন্যায় কল্পলোকের অবতারণা বেশি। তাই সওদাগরপুত্র প্রেম করে রাজকুমারীর ন্যায় সুন্দরী বণিক কন্যার সঙ্গে, উভয়ের মিলনে সৃষ্টি হয় বাঁধা, সওদাগরপুত্র ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করে এবং সব শেষে নানা প্রতিবন্ধকতার পথ পেরিয়ে উভয়ের মিলন সম্পন্ন হয়। সমগ্র কাহিনিতে বাস্তবতার লক্ষণ এতটাই কম যে এই রচনা রূপকথার রূপায়ণ তা বলা যায়।

বঙ্কিম-সৃষ্টির অন্যতম উপন্যাস 'রাজসিংহ'। অনেকেই এই উপন্যাসটিকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' হিসাবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের আড়ালেও রূপকথার জগতের মায়াজাল বিস্তার করেছে যদিও ইতিহাসের শূন্যস্থান রচয়িতা তাঁর কল্পনার দ্বারা পূর্ণ করেছেন এবং এইখানেই রূপকথার ছাড়পত্র থাকে। উপন্যাসের কাহিনির শুরু রূপকথার মতই হয়েছে — "রাজস্থানের পার্বত্য প্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।... রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ।"[৩] শুধু কাহিনির সূচনাতেই নয়, ঐতিহাসিক চরিত্র রাজসিংহের মধ্যেও রূপকথার নায়কোচিত প্রভাব লক্ষিত হয়। রাজসিংহ বীর, দৃঢ়চেতা, পরোপকারী। রূপকথার রাজার ন্যায় তিনিও রাজকুমারীর উদ্ধারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন — "তোমারই জন্য এতদূর আসিয়াছি। তোমাকে অদেয় কিছুই নাই-কি চাও রূপনগরের কন্যে?"[৪] এ জাতীয় বক্তব্য পাঠকের মনকে যেন ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে কল্পনার জগতে পৌঁছে দেয়।

উপকথা:

বঙ্কিমচন্দ্র 'রূপকথা'র পাশাপাশি 'উপকথা' শব্দটিও মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন। লোকসাহিত্যের বিচারে রূপকথা ও উপকথা দুটি ভিন্ন ধারা, কিন্তু সাহিত্যিক কল্পিত কাহিনিকে উপকথা নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমের 'রাধারানী' উপন্যাসটি সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা অতিক্রম করে যায়। এই উপন্যাসে দেখা যায় নায়িকা এক অসহায়া বালিকা যে এক দুর্যোগের রাত্রে অচেনা পথিককে তার মন প্রাণ সমস্ত সমর্পণ করে। এমনকি নায়ক রুক্মিণী কুমারও অজ্ঞাত কুলশীলা রাধারাণীকে মন দিয়ে বসে। নায়ক নায়িকার অদর্শনেও এই যে উভয়ের প্রতি উভয়ের গভীর মিলনাকাঙ্খা ও তপস্যা তা সত্যিই বাস্তবতার সীমারেখা অতিক্রম করে যায়।

উপকথার কল্পনার পাখায় ভর করে লেখা আরও একটি উপন্যাস হলো 'ইন্দিরা'। এই উপন্যাসটি যে ঘটনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে তা তৎকালীন সমাজের একটি জ্বলন্ত সমস্যা। ডাকাতের হাতে ধৃত কন্যার সমাজে কোনো স্থান ছিল না। এই কাহিনির নায়িকা এই সমস্যার বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই করেছে এবং সমাজে ও পরিবারে নিজের পরিচয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এই কাহিনিটি বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও কাহিনি বিন্যাসে রূপকথার আঙ্গিক লক্ষ্যণীয়। নায়িকা ইন্দিরা ডাকাতের হাতে নিগৃহীত হলেও পাচিকা বৃত্তি গ্রহণ করে নিজ পরিবারে ফিরে এসেছে। নানা কণ্টক বিজড়িত পথে অগ্রসর হয়ে ইন্দিরা শেষ পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছে। কাহিনির শেষে মিলনের ঘটনাটি যেন রূপকথার বৈশিষ্ট্যকেই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়।

তবে রূপকথার সরাসরি উল্লেখ আছে 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে। রূপকথা শিশু মনের খোরাক জোগায়। দাদু দিদিমার আপন কল্পনার ঝুলি নিয়ে শিশুদের রূপকথার জগতে নিয়ে যায়। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে ব্রহ্ম ঠাকুরানী হলেন সেই চরিত্র, যিনি নাতি নাতনিদের রূপকথার গল্প শোনাতে সদা প্রস্তুত। তাই সাগর বৌ যখন ব্রহ্ম ঠাকুরানীর কাছে আবদার করে — "ঠানদিদি, একটা রূপকথা বল না"[৫], তখন ঠাকুরানী উত্তর দেন — "কোনটা বলবো, বিহঙ্গামা বিহঙ্গামীর কথা বলব?"[৬] এই কাহিনিতে ব্রহ্ম ঠাকুরানী শুধু মনোরঞ্জনের জন্য রূপকথাকে ব্যবহার করেছেন তা নয় লৌকিক জীবনের প্রয়োজনেও তাকে ব্যবহার করেছেন। সেই কারণেই ব্রজেশ্বরের পুনর্বিবাহের সম্মতি জানতে গিয়ে — "ব্রহ্ম ঠাকুরানী অনেক বিরহ সন্তপ্ত এবং বিবাহ প্রয়াসী রাজপুত্রের উপকথা ব্রজকে শোনাইলেন। কিন্তু ব্রজের মন তাহাতে কিছু বোঝা গেল না।"[৭] এইভাবে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে কাহিনির সঙ্গে অপূর্ব মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নায়িকা ভ্রমরও রূপকথার গল্প শুনতে ভালোবাসে। তাছাড়া সুমতি কুমতির যে উল্লেখ উপন্যাসে আছে তাও যেন রূপকথার ন্যায় ভাল মন্দের প্রতীক। রূপকথায় যেমন ভাল মন্দের সুন্দর বিভাজন পাঠক কাহিনির সূচনাতেই পেয়ে যায়, ঠিক তেমনই লেখক উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন — "সুমতি নামে দেবকন্যা ও কুমতী নামে রাক্ষসী, এই দুইজন সর্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে।"[৮] রূপকথার ন্যায় বিপরীত শক্তির এই যে দ্বন্দ্ব খুব সুন্দরভাবে লেখক তুলে ধরেছেন এই রচনায়। লেখক যেন চরিত্রের নামকরণের মাধ্যমেই রূপকথার ভাল মন্দের দ্বন্দ্বকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। মানব জীবন ভাল মন্দের দ্বন্দ্ব দোলায় আলোড়িত, তাই যেন লেখক রূপকথার কাহিনি গ্রন্থনে তাকে আবদ্ধ করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কথাও উল্লেখ করা যায়। এই উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর গ্রামের যে নামের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো 'ঝুমঝুমপুর'। এই নামটি শুনলেই রূপকথার প্রসঙ্গ মনে আসে। এছাড়াও উপন্যাসের কাহিনি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'কাজলরেখা' রূপকথার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রূপকথায় দেখা যায় কাজলরেখার ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনি অর্থাৎ কাজলরেখা ভাগ্য বিপর্যয়ে দাসীর দাসীতে পরিণত হয়ে জীবন কাটায় —

"রাণী হৈল দাসী আর দাসী হৈল রাণী।
কর্মদোষে কাজলরেখা জন্ম অভাগিনী।"[৯]

একই বিষয় আমরা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেও দেখতে পাই। এই উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী অবস্থা বৈগুণ্যে হীরা দাসীর দাসীতে পরিণত হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হতে পারে সূর্যমুখীর অবর্তমানে নগেন্দ্র ও কুন্দের দাম্পত্য জীবনে কুন্দ গৃহকর্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু হীরার প্রবল প্রতাপে সে হয়েছিল উপেক্ষিত। তাই তো লেখকও উল্লেখ করেছেন — "... এজন্য কুন্দ প্রভুপত্নী হইয়াও দাসীর নিকট দাসীর মত থাকিতে লাগিল, হিরা দাসী হইয়াও প্রভুপত্নীর প্রভু হইয়া বসিল।"[১০] এইভাবে রূপকথার প্রভাব থেকে এই উপন্যাসটি উন্মুক্ত হতে পারল না।

উক্ত আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে রূপকথার প্রয়োগ সার্থক ভাবে ঘটেছে। কোথাও কাহিনি গ্রন্থনে, কোথাও কাঠামো গঠনে, কোথাও চরিত্র চিত্রণে রূপকথার উপাদানগুলি লেখক সুচারুভাবে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

ব্রতকথা:

বঙ্কিম-সাহিত্যে যেমন রূপকথার প্রয়োগ ঘটেছে, ঠিক তেমনি ব্রতকথার প্রয়োগও দেখা যায়। লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে ব্রত প্রসঙ্গে বলেছেন, কিছু কামনা করে মঙ্গল সাধনার নিমিত্তে যা পালন করা হয়, তাকেই ব্রত বলে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতের শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে প্রথমেই ব্রতকে দুইভাগে ভাগ করেছেন — শাস্ত্রীয় ব্রত ও মেয়েলি ব্রত।

সাধারণভাবে নারী সমাজ সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনার তাগিদে ব্রত পালন করে থাকে। দেবতার কাছে নিজের কামনা জানিয়ে আলপনা এঁকে ব্রত পালন করা হয়। সাহিত্য যেহেতু জীবনের দর্পণ তাই সাহিত্যের মধ্যেও ব্রতর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেদিক থেকেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও তাই এর সার্থক ব্যবহার দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ব্রতকথার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সঙ্কটা মঙ্গালচণ্ডী'র ব্রতকথায় কাপালিক ও শঙ্খকুমারের উল্লেখ আছে। ব্রতকথায় দেখা যায় কাপালিক শঙ্খকুমারকে দুটো পথের সন্ধান দিয়েছিলেন — একটি পথ বিপদসঙ্কুল কিন্তু সংক্ষিপ্ত পথ, অপরটি নির্মল অথচ দীর্ঘপথ। একই বিষয় দেখা যায় নবকুমারের ক্ষেত্রেও। নবকুমার চরিত্রে সাহসিকতা ও বীর্যের সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়। একাকী অরণ্যে কাষ্ঠহরণে যাত্রা সত্যিই সাহসিকতার পরিচায়ক, এমনকি অরণ্যে নবকুমারকে বলিদানের জন্য নিয়ে গেলেও তিনি ভয়গ্রস্ত হন নি। এতো গেল চরিত্রের সাদৃশ্য। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলায়'য় দেখা যায় তান্ত্রিক সাধক কাপালিক কয়েকটি আচার পালন করছেন। কাপালিকের মধ্যে দেখা যায় শবসাধনা, আসব পান, নর বলিদান ইত্যাদি। লেখক কাপালিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন — "জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন,... সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুরদিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে — এমনকি যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষ মালা মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে।"[১১] এইভাবে কাপালিকের ভয়ঙ্কর রূপের মাধ্যমে লেখক কাপালিকের নৃশংস মানসিকতার পূর্বাভাস দিয়েছেন। কাহিনিতে নবকুমারের অনিবার্য পরিণতি থেকে কপালকুণ্ডলা রক্ষা করেছে, অন্যদিকে নবকুমারও কাপালিকের হাত থেকে কপালকুণ্ডলার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নবকুমারের মনে কাপালিকের প্রতি যে ভয়ের উদ্ভব হতে দেখা যায় তা কিন্তু দীর্ঘদিনের লোকশ্রুতি থেকে প্রাপ্ত। বলা যায় লোককথার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে। শুধু 'কপালকুণ্ডলা' নয় 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসেও ব্রতের প্রসঙ্গ এনেছেন। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে বিমলার 'বীর পঞ্চমী ব্রত' পালনের কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে বিমলা বলেছে —

"আজ আমার বীর পঞ্চমীর ব্রত, ব্রত করিলে বীরপুত্র হয়,আমি পুত্র কামনা করি... ।"[১২]

ব্রতের উদ্দেশ্য বিমলার বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। এইভাবে ব্রতকথার প্রয়োগ তাঁর লেখনিকে বিশেষ মাত্রায় উন্নীত করেছে।

ইতিকথা:

লোককথার একাধিক বিভাগের মধ্যে ইতিকথাও বেশ প্রচলিত লোককথা। প্রচলিত কিংবদন্তীর ওপর ভিত্তি করেই একাধিক ইতিহাসের কাহিনি গড়ে ওঠে বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রও তাই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে একাধিক কিংবদন্তী বা ইতিকথা ব্যবহার করেছেন, যাকে Legend বলা যায়। এই legend বা ইতিবৃত্ত সাধারণত কোনো বীর অথবা সাধক চরিত্র অবলম্বন করে রচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বেশ কিছু উপন্যাস ইতিকথা প্রভাবিত তা বলা যেতে পারে। তাঁর একাধিক উপন্যাস ইতিহাসকে আশ্রয় করে রচিত হলেও 'রাজসিংহ' লেখকের মতে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। যে-কোনো ইতিহাসের চরিত্র বা ঘটনা জনগণের মানসিক স্পর্শে ইতিকথার বিষয় হয়ে ওঠে। লেখকের শেষ তিনটি উপন্যাস — 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসের কিছু ঘটনা ও প্রবাদের উপর ভিত্তি করে রচিত। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ঐতিহাসিক পরিবেশের প্রভাব যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি 'দেবী চৌধুরাণী'তে রয়েছে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও 'সীতারাম'এ ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রভাব।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কাহিনি অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক অরাজক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বিস্তার করেছে। এই উপন্যাসটি ঐতিহাসিক পরিবেশে রচিত। এই সময়ে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বাংলার সমাজে মাথা চারা দিয়েছিল যদিও এই উপন্যাসের সন্ন্যাসীগণ ইতিহাসের সন্ন্যাসী থেকে মূলত ভিন্ন। আসলে ইতিকথার মধ্যে অলৌকিকতার প্রাধান্য থাকে, তাই তো 'আনন্দমঠ'এ 'মহাপুরুষের' মধ্যেও অলৌকিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বলা যায় বঙ্কিম-উপন্যাসে ইতিহাসের ছায়ায় ইতিকথার কারুকার্য প্রাধান্য লাভ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী' বাংলার প্রচলিত কিংবদন্তীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফলে দেশ জুড়ে শোষণ ও লুণ্ঠন চলেছিল। সেইসময়ে 'দেবী চৌধুরাণী' নামে এক নারী ডাকাতের কথা পাওয়া যায়। ইতিহাসের এই চরিত্রটিকে বঙ্কিমচন্দ্র অলৌকিক মহিমা ও ব্যক্তিত্বে উন্নীত করেছেন।

এই উপন্যাসে দেবী চৌধুরাণীর প্রেম, মাধুর্য, উদারতা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে অনেকটা ম্লান করে দেয়।

ইতিবৃত্তের বৈশিষ্ট্য আরো একটি উপন্যাসে প্রকট হয়েছে সেটি হলো 'সীতারাম'। বাংলাদেশের ইতিহাসে জনশ্রুতি আছে যে সীতারাম নামে এক বীর ছিলেন, যিনি আপন বাহুবলে রাজ্য বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে বীর, সাহসী, বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাম্রাজ্য বজায় রাখতে পারেন নি। এই অসফলতার ইতিহাসের সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এই জায়গাতেই লেখক আপন কল্পনার আলোকে সীতারামের পতনের নাটকীয় কারণ উপস্থাপিত করেছেন। লেখক উল্লেখ করেছেন পত্নী শ্রীর প্রতি মোহই সীতারামের ধ্বংসের কারণ। এমনকি কাহিনির শেষ অংশও লেখকের কল্পনাপ্রসূত। এইভাবেই সীতারামের কিংবদন্তী 'সীতারামের' গঠন পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। এই তিনটি উপন্যাসে ইতিবৃত্তের প্রাধান্য লক্ষ করা গেলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা'র রচনার ক্ষেত্রেও ইতিকথার ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে সমালোচক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছিলেন —

"আমাদের মেজঠাকুরদাদার (খুল্লপিতামহের) মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারাণ গ্রাম, জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিংবদন্তী রূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজ ঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন এবং মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী-কন্যাকে বন্দি করিয়া লইয়া যায়। রাজপুত তিলক কুমার জগত সিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দি হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হইল।"[১৩]

সুতরাং সহজেই বলা যায় 'দুর্গেশনন্দিনী'র উৎসও কিন্তু কিংবদন্তী, যা লোকমুখে প্রচারিত ও প্রসারিত। এই প্রসঙ্গে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কথাও মনে পড়ে যায়। এই উপন্যাসের উৎস প্রসঙ্গে জানা যায় যে, তিনি যখন মেদিনীপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পোষ্টে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি কাপালিক প্রসঙ্গে একটি কিংবদন্তী শুনতে পান। তাই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এই উপন্যাসটির কেন্দ্রেও রয়েছে কিংবদন্তী।

উপরিউক্ত প্রসঙ্গগুলি বাংলাদেশের মৌখিক ও লিখিত একাধিক সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখনীর কারিগরী ক্ষমতা মানবিক সংকটের শিরায় শিরায় বাঙালিয়ানাকে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। তাই তাঁর রচনা যেমন একদিকে বপন করেছে তৎকালীন জীবন প্রবাহকে, অন্যদিকে লোকায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে। আজকের পরিবর্তনশীল সমাজ ও সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যচেতনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই ঐতিহ্যের যোগসূত্র রচনায় বঙ্কিমের উপন্যাসে লোককথার অন্বেষণ সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান সম্পদ তা বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১। 'বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস', আশুতোষ ভট্টাচার্য, সং ১৩৭১, পৃ. ৫১-৫২
২। 'বঙ্কিম সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি', বেলা মুখোপাধ্যায়, রূপকল্প প্রকাশন, বর্দ্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, পৃ. ২০
৩। 'বঙ্কিম রচনাবলী', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, জানুআরি ১৯৯১, পৃ. ৫৮৬
৪। ওই, পৃ. ৬২৯
৫। ওই, পৃ. ৭৭৬
৬। ওই, পৃ. ৭৭৪
৭। ওই, পৃ. ৭৭৭
৮। ওই, পৃ. ৫৫৭
৯। 'মৈমনসিংহ গীতিকা', দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, প্রজ্ঞা বিকাশ, জুলাই ২০২১, পৃ. ১৭৬
১০। 'বঙ্কিম রচনাবলী', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, জানুআরি ১৯৯১, পৃ. ২৮৯
১১। ওই, পৃ. ১১৬

১২। 'বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী' প্রথম খণ্ড, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৯
১৩। 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, পৃ. ৫০

লেখক পরিচিতি: অন্তরা গোস্বামী, অধ্যাপিকা, কলকাতা দক্ষিণেশ্বরের হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল উইমেন কলেজ। বর্তমানে শিলচরের অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষিকা